নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০৩/১০/২০২১ (পৃঃ ০৫)

ধান উৎপাদন আমদানি ও বাজার পরিস্থিতি

মোঃ আব্দুর রউফ সরকার

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে চালের উৎপাদন ছিল মাত্র ৯.৯৩ মিলিয়ন টন। কৃষি ছাড়া বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় এ বিষয়টি অনুধাবন করে বঙ্গবন্ধু কৃষি খাতকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। জাতীয় পরিকল্পনায় কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত করেন এবং সেই আলোকে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ জোরদার করেন। এর প্রেক্ষিতে পরবর্তী দুই বছরেই ধান উৎপাদন প্রায় ২৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৯০-৯১ সালে এই উৎপাদন বেড়ে হয় ১৭.৮৫ মিলিয়ন টন। পরবর্তীতে স্বাধীনতার দীর্ঘ ২৫ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে কৃষি খাতকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে কৃষি উপকরণ তথা সার, বীজ ও সেচ ব্যবস্থা সহজলভ্য করেন। কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা যথাযথ বাস্তবায়নে জোর দেন। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কারিগর তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালে সর্বপ্রথম ধানের উৎপাদন ১৯৭১ সালের তুলনায় দ্বিগুণ (২৩.৯২ মিলিয়ন টন) করতে সক্ষম হন। ২০০০-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার যখন ক্ষমতা ছাড়ে তখন চালের উৎপাদন ছিল ২৫.০৯ মিলিয়ন টন। গত ১২ বছরে চালের উৎপাদন ৬.০ মিলিয়ন টন হারে বেড়েছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০২০-২১ সালে চালের উৎপাদন অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে ৩৭.৬৮ মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়েছে। বাংলার মানুষ আজ তিন বেলা খেতে পারে। কারও কাছে আজ আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য ভাতের জন্য হাত পাততে হয় না। বর্তমানে ধান উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ২.৮০%, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭% এর তুলনায় বেশি।

ভবিষ্যত খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ধানের উৎপাদন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্রি ভবিষ্যত ধান উৎপাদনের একটি রোডম্যাপ, Doubling Rice Productivity প্রণয়ন করেছে। যেখানে ২০৩০, ২০৪০ ও ২০৫০ সালে বাংলাদেশে পরিবর্তিত জলবায়ু ও বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য কি পরিমাণ ধান উৎপাদন প্রয়োজন এবং কিভাবে তা অর্জন হবে, তার একটি বাস্তবধর্মী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। আমরা দেখিয়েছি Genetic potentiality বাড়িয়ে, কৃষি তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে yield loss কমিয়ে, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও উচ্চফলনশীল জাত সম্প্রসারণের মাধ্যমে unexplored land চাষের আওতায় এনে, তিন বছরের মধ্যে diffusion intensity বাড়িয়ে adoption lag minimization করে এবং পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতের মাধ্যমে কৃষকদের চাষাবাদে উৎসাহিত করে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি উপরোক্ত কর্মপরিকল্পনাগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে ২০৩০, ২০৪০ ও ২০৫০ সালে চালের উৎপাদন হবে যথাক্রমে ৪২.৮৫, ৪৮.২১ ও ৫৩.৪২ মিলিয়ন টন। এটি স্বপ্ন নয়, এটি বাস্তবায়নে আমাদের সকলকে সমন্বিতভাবে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে।

দেশে চালের চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি উৎসকে বিবেচনায় নেয়া হয়। উৎস দুটি হচ্ছে হিউম্যান কনজাম্পশন ও নন-হিউম্যান কনজাম্পশন। হিউম্যান কনজাম্পশন বলতে সাধারণত জনপ্রতি চালের পরিমাণ, মুড়ি, চিড়া, খই, পিঠা, ও বিভিন্ন বেকারী পণ্য প্রস্তুতে চালের ব্যবহারকে বোঝায়। ব্রি'র গবেষণা থেকে প্রাপ্ত চালের হিউম্যান কনজাম্পশন মোট উৎপাদনের প্রায় ৭৩.৭৮ ভাগ। যার মধ্যে জনপ্রতি চালের চাহিদার পরিমাণ ৬৬.৬৫%, মুড়ি ৫.০১%, চিড়া ০.৯১%, খই ০.৩৬% এবং পিঠা ও বেকারী পণ্য ০.৮৬%। অন্যদিকে নন-হিউম্যান কনজাম্পশন বলতে সাধারণত বাৎসরিক বীজের চাহিদা, ফিড ও অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনজাম্পশন, কর্তনকালীন ক্ষতি, ফলোনোত্তর ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অপচয়কে বোঝায়। গবেষণা দেখা গিয়েছে প্রাপ্ত চালের নন-হিউম্যান কনজাম্পশন মোট উৎপাদনের প্রায় ২৬.২২ ভাগ। যার মধ্যে বাৎসরিক বীজের চাহিদা মেটাতে ব্যয় হয় মোট উৎপাদনের প্রায় ১.৫২ ভাগ। এছাড়াও ফিড ও অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনজাম্পশন, কর্তনকালীন ক্ষতি, ফলোনোত্তর এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে অপচয়কে বিবেচনায় নিলে দেখা যায় যে তা মোট উৎপাদনের যথাক্রমে প্রায় ৫.১৫, ৫.২০, ৭.১০ ও ৭.২৫ ভাগ। উপরোক্ত চালের ব্যয়গুলো ব্যতীত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অপচয় হচ্ছে গৃহস্থালীর অপচয়। একটি রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশে মোট ভোগকৃত চালের প্রায় ৫.৫% অপচয় হয়। এই অপচয়ের মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুতি পর্যায়ে প্রায় ৩.০%, পরিবেশন পর্যায়ে ১.৪% এবং প্লেটের অপচয় হচ্ছে ১.১%। অপচয়ের প্রধান কারণগুলো হলো আমাদের অজ্ঞতা এবং বিলাসবহুল মানসিকতা। উল্লেখ্য, সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গৃহস্থালীর অপচয় হ্রাস করতে পারলে দেশের চালের মোট চাহিদার শতকরা ৫.৫ ভাগ প্রশমিত করা সম্ভব হবে। ব্রি আগামী ২০৫০ সাল পর্যন্ত হিউম্যান ও নন-হিউম্যান কনজাম্পশন বিবেচনায় নিয়ে চালের চাহিদা নিরূপণ করেছে। প্রাক্কলনে দেখা যাচ্ছে যে, চালের চাহিদা প্রতি বছর গড়ে ১.০৭ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই চাহিদা ২০০৯ সালে ছিল ৩০.২১ মিলিয়ন টন, যা ২০২০, ২০৩০, ২০৪০ ও ২০৫০ সালে হবে যথাক্রমে ৩৪.১১, ৩৮.৩২, ৪২.৫৯ ও ৪৬.৭৩ মিলিয়ন টন।

বাংলাদেশে চালের চাহিদা ও সরবরাহের বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে ২০০৯ সাল থেকে আমরা ধারাবাহিকভাবে চাল উৎপাদনে উদ্বৃত্ত রয়েছি। এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমপক্ষে বছরে গড়ে প্রায় ২১ লাখ টনের বেশি হয়। ২০০৯ সালে আমাদের চালের উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২.২৬ মিলিয়ন টন। এই ধারাবাহিকতায় ২০২০, ২০৩০, ২০৪০ ও ২০৫০ সালে চালের উদ্বৃত্তের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ৩.৪৫, ৪.৫৩, ৫.৬১ ও ৬.৭০ মিলিয়ন টন।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এতো উদ্বৃত্তের পরেও কেন আমরা চাল আমদানি করছি। এই প্রশ্নটির উত্তর দেয়ার আগে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। দেশে চালের ঘাটতি ও বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য যদি আমদানি করতে হয়, তাহলে ১৭ লাখ টন চাল আমদানির পরেও কেন বাজারে চালের দাম কমছে না? চালের ঘাটতির জন্য কেউ কি অনাহারে আছে? কেউ কি বাজারে গিয়ে চাল না পেয়ে ফিরে এসেছে? ক্ষয়ক্ষতি না হলেও বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের আভাস পেলেই কি কারণে বাজারে চালের দাম বেড়ে যায়? কে বা কারা এই সব কারসাজির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এই দায়ভার কার? তাহলে কি কারও দ্বারা বাজার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে? আমাদের উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ। আর অর্থনীতির ভাষায় বলতে হয় বাজারে অদৃশ্য হাত কাজ করছে, যারা super normal profit করার জন্য বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সাধারণত সরবরাহ বাড়লে দাম কমে যায়, ঘাটতি থাকলে দাম বেড়ে যায়। কিন্তু যখন সরবরাহের এই সাধারণ নীতিটি কাজ করে না তখন বুঝতে হবে বাজারকে কেউ manipulate করছে। আমরা একটি দীর্ঘমেয়াদি বার্ষিক Marketable surplus এবং Market price এরমধ্যে সামগ্রিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত চালের উদ্বৃত্ত এবং দামের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ চালের সরবরাহ বাড়লে দাম কমে যায়। কিন্তু ২০০৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত এই সম্পর্ক সমমুখী ছিল, যার অর্থ চালের সরবরাহ বাড়লেও দাম কমেনি বরং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং, বার্ষিক চালের উদ্বৃত্ত এবং দামের মধ্যে সামগ্রিক সম্পর্ক থেকে দেখা যায় যে, চালের মূল্য নির্ধারণে প্রচলিত বাজারে সরবরাহ ও চাহিদা শক্তির পরিবর্তে অন্য কোন তৃতীয় শক্তি কাজ করছে অথবা অন্য কোন বাজার এ্যাক্টরের নিকট বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রয়েছে। চালের মূল্য বিস্তার (price spread) বিশ্লেষণ থেকেও বাজারের মধ্যস্বত্বভোগী বিশেষ করে মিলার, আড়তদার এবং পাইকাররা অতি মুনাফা অর্জন করে থাকে বলে অনুধাবন করা যায়।

সাম্প্রতিককালে বাজারে চালের মূল্য অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়তে থাকায় কৃষক, ভোক্তা, সরকার এবং নীতিনির্ধারকদের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। তাই ব্রি-বাংলাদেশে চালের মূল্যবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি মাঠপর্যায়ে জরিপ সম্পন্ন করে। জরিপে চালের মূল্যবৃদ্ধির নিম্নোক্ত কারণগুলোর উঠে এসেছে– (১) ব্যবসায়ী ও মিল মালিকরা করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কা করে ধান ও চালের মজুদ ধরে রেখেছিল। ফলে বাজারে সরবরাহ কমে গিয়েছিল; (২) বড় মিল মালিক ও ব্যবসায়ীদের আধিপত্য এবং অসম প্রতিযোগিতা; (৩) প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধানের জমি ও উৎপাদন তথ্যের অসামঞ্জস্যতা। এটিকে পুঁজি করে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বাজারে ধান-চালের ঘাটতির অপপ্রচার করে। তাদের ধারণা সরকার যে তথ্য প্রকাশ করে, তার প্রায় ৩০ ভাগ over-estimation করা হয়; (৪) প্রায় সকল কৃষকই ধান কর্তনের প্রথম মাসের মধ্যে বাজারজাতযোগ্য উদ্বৃত্তের একটা বড় অংশ বিক্রি করে দেয়। কিন্তু গত বোরো ও আমন মৌসুমে করোনা পরিস্থিতিতে ধান বিক্রির ধরনটি পরিবর্তিত হয়েছে। কৃষকরা তাদের ধান মজুদ থেকে ধীরে ধীরে বিক্রি করেছে, এতে সরবরাহ চেইন কিছুটা সঙ্কুচিত হয়েছিল; (৫) সরকার কর্তৃক কম চাল সংগ্রহ ও আমদানি বিলম্বিত হওয়া এবং প্রয়োজনীয় বাজার হস্তক্ষেপের অভাব; (৬)ধান চাষের ব্যয় প্রক্রিয়াজাতকরণের খরচ বৃদ্ধি; এবং (৭) মৌসুমী ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি।

বর্তমান চালের মূল্যবৃদ্ধি রোধে করণীয়সমূহ- (১) ধান/চাল সংগ্রহ পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা। কৃষকের নিকট থেকে সরাসরি ধান সংগ্রহ এবং মিলারদের মাধ্যমে তা চালে পরিনত করা; (২) চিকন ও মোটা দানার চালের জন্য পৃথক ন্যূনতম সহায়তা মূল্য (এমএসপি) ঘোষণা করা; (৩) ন্যূনতম ২৫ লাখ টন চাল সংগ্রহ করা এবং মোট উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশ সংগ্রহ করার সক্ষমতা অর্জন করা; (৪) বাফার স্টক হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রতি মাসে কমপক্ষে ১২.৫ লাখ টন চাল মজুদ নিশ্চিত করা; (৫) উৎপাদন ব্যয়ের ওপর কমপক্ষে ২০ শতাংশ মুনাফা বিবেচনা করে ধান-চালের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা; (৬) ধান উৎপাদনে আরও বেশি উপকরণ সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ এবং প্রয়োজনে নগদ সহায়তা প্রদান করা; (৭) চাল উৎপাদনে ব্যয় কমানোর কৌশল, নিবিড় বাজার নিরীক্ষণ, ধান প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ এবং সময়মতো সরকারী হস্তক্ষেপ বাজারে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক হতে পারে; এবং (৮) কৃষিযান্ত্রিকীকরণে ব্যাপক সম্প্রসারণ করা।

তদুপরি সরকারকে একজন গুরুত্বপূর্ণ এ্যাক্টর হিসেবে বাজারে নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে হবে। তাহলেই কৃষক ও ভোক্তার স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকবে।

লেখক : কৃষি অর্থনীতিবিদ, ব্রি
mdrouf.bau@gmail.com

দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
তারিখঃ ০২/১০/২০২১ (পৃঃ ১১)

ব্রির ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর ॥ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত সাতটি হাইব্রিডসহ মোট ১০৬টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। যা দেশের ৮০ ভাগ জমিতে চাষাবাদ হয় এবং শতকরা ৯১ ভাগ ধান উৎপাদন হয় এসব জাত থেকে।

শুক্রবার ব্রি'র ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানিয়েছেন মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নানা কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। সকালে গাজীপুরস্থ ইনস্টিটিউটের সদর দফতরে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার শুরুতেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ব্রি'র মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর। এসময় ব্রি'র পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), পরিচালক (গবেষণা)সহ বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা প্রধানগণ এবং ক্রিয়াশীল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরে ব্রি'র প্রশাসনিক ভবনের সামনে সংক্ষিপ্ত আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ব্রির মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জমান। সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. আবুবকর ছিদ্দিক। আলোচনাসভা শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন মহাপরিচালক। আলোচনাসভা সঞ্চালনায় ছিলেন সিনিয়র সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) কাওছার আহমদ।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখঃ ০২/১০/২০২১ (পৃঃ ০৩)

ব্রির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

গাজীপুর প্রতিনিধি

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গতকাল বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে গাজীপুরে ইনস্টিটিউটের সদর দফতরের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর দিনের কর্মসূচি শুরু করেন। পরে ব্রির প্রশাসনিক ভবনের সামনে আলোচনা সভা শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন মহাপরিচালক। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত সাতটি হাইব্রিডসহ মোট ১০৬টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ০২/১০/২০২১ (পৃঃ ০৩)

ব্রির ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গতকাল শুক্রবার পালিত হয়েছে। সকালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। এ সময় ব্রির পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), পরিচালক (গবেষণা), বিভাগ ও শাখা প্রধানরা এবং ক্রিয়াশীল সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে ব্রির প্রশাসনিক ভবনের সামনে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা হয়। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জমান। সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. মো. আবু বকর ছিদ্দিক। পরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়। ব্রির জনসংযোগ বিভাগ সূত্র জানায়, ব্রি ১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত সাতটি হাইব্রিডসহ ১০৬টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে যা দেশের ৮০ ভাগ জমিতে চাষাবাদ হয় এবং শতকরা ৯১ ভাগ ধান উৎপাদন হয় এসব জাত থেকে।